ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 190–195
www.athenajournalcbm.in

ভারতশিল্প ও নিবেদিতার সৌন্দর্যচেতনা

ড. কাজল গাঙ্গুলী*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ২২.০৪.২০২৫ গৃহীত: ০৮.০৬.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *বিবেকানন্দের ডাকে মানবমুক্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় আসেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ওরফে নিবেদিতা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে, তার ঐতিহ্যকে যথোচিত মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করতে হবে। জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণাশক্তি হয়ে উঠতে পারে ভারতের সমৃদ্ধ অতীত-ঐতিহ্য। দেশের মানুষকে শিকড়-সন্ধানীর দৃষ্টি দান করে তিনি এদেশের মানুষের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, দেশাত্মবোধ ও শিল্পকলা পরস্পর অন্বিত একটি সাধারণ বিষয় এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতীয় জীবনের পাশাপাশি জাতীয় শিল্পের জাগরণও বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিনি বুঝেছিলেন ইউরোপের নকলনবিশি নয়, ভারতশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও বিশ্বের দরবারে তার পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে এ দেশীয় সমকালীন শিল্পীদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। সিস্টার আর হ্যাভেল সাহেবের যুগ্ম প্রেরণায় ভারতশিল্পের যথোচিত মর্যাদা রক্ষার ভার নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের মডার্ন রিভিউতে ছাপা এঁদের ছবির সঙ্গে নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দিতেন। এই কাজে তিনি প্রয়াস পেয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভারতশিল্পের একনিষ্ঠ প্রচারকের সদিচ্ছার জন্য। তাঁর ও রামানন্দের যৌথ উদ্যোগে ধীরে ধীরে সাধারণ বাঙালির ছবি দেখার চোখ ও মন তৈরি হয়েছিল। একটি পরাধীন দেশের মানবসমাজের দুঃখ যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, নিয়ত শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে, সৌন্দর্যচেতনার নির্বাধ চেতনায় দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ গ্লানিময়তা থেকে একটি জাতির উত্তরণ তথা মুক্তির সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা।*

সূচক শব্দ: *নিবেদিতা, ভারতশিল্প, জাতীয়তাবাদ, শিল্পকলা, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, মডার্ন রিভিউ।*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: ganguli111kajal@gmail.com

মূল প্রবন্ধ

বিবেকানন্দের ডাকে মানবমুক্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষের বুকে মোম্বাসা জাহাজে কলকাতায় পৌঁছলেন ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৮ মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পরবর্তী সময়ে যিনি ভারতবর্ষের কাছে পরিচিত হবেন নিবেদিতা নামে। নিজের দেশ আয়ারল্যান্ডের পরাধীনতার যন্ত্রণা তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল। তাই এদেশে পৌঁছেই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হলো ইংরেজের শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, তার ঐতিহ্যকে যথোচিত মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করতে হবে। জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণাশক্তি হয়ে উঠতে পারে ভারতের সমৃদ্ধ অতীত-ঐতিহ্য। দেশের মানুষকে শিকড়-সন্ধানীর দৃষ্টি দান করে তিনি এদেশের মানুষের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মসাহিত্য ও শিল্পকলার মর্মকথা অনুশীলন করেছিলেন। নারীশিক্ষা, সেবাপরায়ণতা, স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে এ দেশের শিল্প আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণেও তিনি সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর প্রত্যয়ে ছিল: "শিল্পের নবজন্ম চাইই। এখন আমরা যার সঙ্গে পরিচিত সেই হবু সাহেবিয়ানার দুঃখজনক অনুকরণ প্রয়াসের দ্বারা তা ঘটবে না। জনগণের কাছে পৌঁছবার জন্য শিল্পের তুল্য ভাষা আর কোথাও নেই। একটি সঙ্গীত—একটি চিত্র—এরা হয়ে উঠতে পারে অগ্নিক্রুশ। (আধপোড়া কাঠের অমসৃণ ক্রুশ, যা স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে চালান দেওয়া হতো যুদ্ধবার্তা ঘোষণার জন্য)—যা সকল উপজাতির মধ্যে পৌঁছে গিয়ে তাদের সংগঠিত করবে অখণ্ড জাতিরূপে। শিল্পের নবজন্ম হবেই হবে—কারণ তা পেয়ে গেছে নতুন বিষয়বস্তু—যার নাম স্বয়ং ভারতবর্ষ।"[১]

তিনি মনে করতেন, দেশাত্মবোধ ও শিল্পকলা পরস্পর অন্বিত একটি সাধারণ বিষয় এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতীয় জীবনের পাশাপাশি জাতীয় শিল্পের জাগরণও বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিনি বুঝেছিলেন ইউরোপের নকলনবিশি নয়, ভারতশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও বিশ্বের দরবারে তার পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে এ দেশীয় সমকালীন শিল্পীদের মনোভাবের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। এ দেশের মাটিতে পা রাখার আগে একই ভাবে আইরিশ জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে তিনি আয়ারল্যান্ডের শিল্প ও লোকসংস্কৃতির জাগরণ চেয়েছিলেন। সেই প্রতীতি থেকে ভারতে এসেও তিনি চাইলেন, চারু ও কারু, দুই শিল্পধারাতেই গণজাগরণ সংগঠিত হোক। তিনি মনে করতেন, "জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্বোধনের উপরেই ভারতবর্ষের অশেষ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় শিল্পকলা, জাতীয় চেতনা আর জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যই দরকার। নইলে বনেদ পোক্ত কিছুতেই হতে পারে না।"[২]

নিবেদিতা কলকাতায় পৌঁছনোর বছর দেড়েক আগে ৬ জুলাই, ১৮৯৬ আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল কলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে হ্যাভেল সাহেব আর্ট কলেজের সিলেবাসে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনে প্রাচ্যদেশীয় কলাশিল্পের প্রতি নজর ফেরানোর কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। তা নিয়ে রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে এদেশীয় পাশ্চাত্য অনুসারী শিল্পীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা তখন চরমে তবুও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটলেন না। তাঁর এই অগ্রগমনে সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে পেলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য রূপকলার বন্ধন থেকে শিল্পকলাকে মুক্ত করে আধুনিককালের ভারতীয় কলাবিদ্যাকে প্রাচ্যধারায় সমৃদ্ধ করে তোলা। নিবেদিতা কলকাতায় এলে হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। হ্যাভেল সাহেব যখন বলতেন, "আমি ছাত্রদের রেখা টানতে বা রঙ চড়াতে শেখাতে পারি কিন্তু তাকে শিল্পী তৈরি করতে পারিনা কিংবা জিনিয়াস বানাতে।" তখন আত্মবিশ্বাসী নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন, "এ কাজ কঠিন কিছু নয়। দেশপ্রেম, স্বজনপ্রীতি, বংশগৌরব, উচ্চাভিলাষ আর ভারতীয় আদর্শকে বুঝবার জন্য অসীম ব্যাকুলতা—এই গুণগুলির সমাবেশ হলেই শিল্পে, বিজ্ঞানে আর ধর্মে শক্তির এমন জোয়ার আসবে যা ঠেকানো যাবে না। সুতরাং তুলি ধরতে শেখাবার সময় ছাত্রদের এইভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে যথার্থ শিল্পী

গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পরানুকরণের হালকা হাওয়ায় ভাসলে আখেরে উপকার হয় না।"[৩] হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমমনস্ক নিবেদিতার যোগদান আধুনিকতার নামে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের গতানুগতিক ধারণাকে আন্দোলিত করে তোলে এবং ভারতশিল্পের এই নবযাত্রা আরও সুসংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই সময় নিবেদিতার মধ্যস্থতায় জাপানি দার্শনিক ও শিল্পী ওকাকুরা কাকুজোর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ওকাকুরা প্রাচ্যের শিল্পকলার উদ্বোধনে ঠাকুরবাড়ির শিল্পীদের মনকে সমবেত এক ভাবনায় নিবিষ্ট করতে চাইলেন—এশিয়া এক, এশিয়ার আত্মিক স্বরূপ অভিন্ন। জাপানে ফিরে গিয়ে ওকাকুরার উদ্যোগে ভারতবর্ষে এলেন তিনজন জাপানি শিল্পী—ইওকোয়ামা টাইকান, যোশিও কাৎসুতা ও হিসিদা সুনসো। ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে এঁদের মাধ্যমে জাপানি চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুই দেশের মধ্যে পরস্পর নির্ভর এই সম্পর্ক যে দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয়েছিল তারও নেপথ্যে ছিলেন নিবেদিতা।

সিস্টার আর হ্যাভেল সাহেবের যুগ্ম প্রেরণায় ভারতশিল্পের যথোচিত মর্যাদা রক্ষার ভার নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিবেদিতা আর অবনীন্দ্রনাথ পরস্পর পরস্পরকে সম্মানের চোখে দেখতেন। একজন ছিলেন অন্যের গুণমুগ্ধ। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, "ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়ো।"[৪] অন্যপক্ষে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে (৫.০৮.১৯০৯) নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে 'Leader of the art movement' বলে উল্লেখ করছেন। আমেরিকান কনসালের বাড়িতে নিবেদিতাকে দেখে অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল: "ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি!"[৫] আবার আর্ট সোসাইটির এক পার্টিতে নিবেদিতাকে দেখার অভিজ্ঞতা অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়: "কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা— সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"[৬] অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সীতা, সাহজাহানের তাজ স্বপ্ন, সাহজাহানের অন্তিমশয্যা আর ভারতমাতা ছবির উপর তিনি বিশদে আলোচনা করেন। সাহজাহানের অন্তিমশয্যা ছবিটি সম্পর্কে নিবেদিতা সবাইকে গর্বভরে জানাতেন: এই হচ্ছে প্রকৃত ভারতকথা।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় উত্তাল বাংলায় স্বদেশি হাওয়া জোরালো হয়ে ওঠে। জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'ভারতমাতা' ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ নিবেদিতা প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৩ সংখ্যায় লিখলেন: "এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়।... ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে— ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।..."[৭] ভারতমাতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর যদি যথেষ্ট অর্থ থাকত, তা হলে ভারতের নবধারার প্রতীক— ভারতমাতা ছবিটি ছাপিয়ে কেদার থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি চাষির ঘরে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

নিবেদিতা প্রায় নিয়মিত আর্ট স্কুলে আসতেন এবং অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদল, নন্দলাল বসু, সুরেন গাঙ্গুলী, অসিতকুমার হালদারদের প্রাচীন কাব্য-পুরাণ অবলম্বনে ছবি তৈরি করতে উৎসাহ দিতেন। নন্দলালের 'উমার তপস্যা' বা 'সতী' ছবিগুলিতে যে নিবেদিতার প্রভাব ছিল একথা নন্দলাল নিজেই জানিয়েছেন— "স্ফটিক আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে থাকতেন সিস্টার সদা সিল্কের ক্লোকের ওপর। ধপধপে বরফের মতো সাদা চেহারা। অপূর্ব সুন্দরী। তাঁকে দেখেছি বেশ ক'বার। আমার সতী বা উমার তপস্যা ছবির খানিকটা তার চেহারার ছিল বৈকি।"[৮] সুরেন গাঙ্গুলীর 'যশোদা ও কৃষ্ণ' ছবিটি সিস্টার নিবেদিতার Cradle Tales of Hinduism বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা।

নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখা হয়েছিল এই আর্ট স্কুলেই। নিবেদিতা নন্দলালের দুখানা ছবি সেদিন দেখেছিলেন— কালী আর সত্যভামার মান। নন্দলালের আঁকা ছবিতে কালী মূর্তির গায়ে ছিল কাপড় জড়ানো। কাপড়

পরা কালী দেখে নিবেদিতা অবাক হয়ে বলেছিলেন— "এ কী, কালী যে উলঙ্গিনী, কোনো আবরণ নেই তাঁর গায়ে; কাপড়-চোপড় দিয়ে এমন জবর-জং করেছো কেন? স্বামীজীর লেখাটা পড়ে দেখো।"[৯] একদিন নন্দলাল বোসপাড়া লেনে সিস্টারের বাড়িতে সুরেন গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ছোট্ট দোতলা বাড়ির মধ্যে একটি বসার কামরা। সিস্টার তখন ঘরে ছিলেন না। ওরা বসলেন সোফাতে। কিছুক্ষণ পর সিস্টার ঘরে এসে বললেন, "তোমরা নীচে নেমে পা মুড়ে আসন হয়ে বসো।" সিস্টারের মুখে এই কথা শুনে নন্দলালের মনে খুব অভিমান হলো। তারা ভাবল মেমসাহেব তাদেরকে নেটিভ বলে অপমান করলেন। সিস্টার তাদেরকে বোঝালেন— তোমরা হলে বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভালো লাগে না। এই দেখো, তোমরা যে মেঝেতে এইভাবে বসেছো ঠিক যেন বুদ্ধের মতন বসাটি হয়েছে। নন্দলাল লিখছেন, "তখন আমাদের সব অভিমান চলে গেল ও তাঁর আইডিয়াটা ধরতে পারলাম।"[১০] নন্দলাল নিজের আঁকা অনেকগুলি ছবি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'দশরথের মৃত্যু' দেখে সিস্টার বলেছিলেন, "আমার খুব ভালো লাগছে। এই যে ঘরটা করেছ, এটা খুব কাম অ্যান্ড কোয়াইট মনে হচ্ছে— ঠিক শ্রীমায়ের ঘরের মতো। তাই বোধহয়, এত ভালো লাগছে আমার।"[১১] সিস্টার তাদের রামায়ণ-মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনিকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকতে উপদেশ দিতেন। নন্দলালের 'সতী' আর 'গান্ধারী' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'তে প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩১৫ সালে। এই সতী ছবিটির উৎকর্ষ সম্পর্কে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় সিস্টার লিখেছিলেন: "From the cloistered wifewood of the old Indian home to the martyr death of the Great saint—was it not in truth a path of glory, on which each foot print should receive our salutation?" তিনি জানাতে ভোলেন না, এ যুগে সহমরণ বাঞ্ছনীয় নয়। সম্পূর্ণ প্রতিবেদনে উঠে আসে সহমরণে অংশ নেওয়া সতীদের সাহস ও নিষ্ঠার কথা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জাতিগত এই সাহস আর নিষ্ঠাই ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। নন্দলালের পুরাণকল্পে আঁকা সতী ছবির সাযুজ্যে সমকালীন জাতীয়চেতনার দিশা অন্বেষণ, নিবেদিতা প্রদত্ত এই পাঠ চিত্রকলার ইতিহাসে এই প্রথম।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই চিত্রকলা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করার ভার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তখন ছবিতে রাজা রবিবর্মার (১৮৪৮—১৯০৬) খুব নামডাক। ভারতীয় ইতিহাস অনুসরণে তিনি ইউরোপীয় ধাঁচে ছবি এঁকে ভারতীয় চিত্রশিল্প জগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিলেন। রবিবর্মার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল রবিবর্মার ছবির প্রতি রামানন্দের পক্ষপাত। রবিবর্মার ছবির প্রচার ও প্রসারে প্রবাসী সম্পাদক ছিলেন অতি উৎসাহী। প্রবাসীর অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৮ সংখ্যায় 'রাজা রবিবর্মা' প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে রামানন্দ লেখেন: "ভারতে মহা মহা কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি ও সঙ্গীতবিশারদ অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু এই রত্নপ্রসূ পুণ্যভূমির উপযুক্ত একজনও চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই।... ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখন লিখিত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।"[১২] ছবিতে ভারতীয় পুরাতন শৈলীর অবাস্তবতার ত্রুটি দূর করে ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুসারী বাস্তবসম্মত ছবিতে রবিবর্মা কতদূর সিদ্ধহস্ত তা প্রমাণ করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটে। ভারতশিল্প বিষয়ে নিবেদিতার আগ্রহ দেখে তাঁদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। নিবেদিতার সঙ্গে দীর্ঘ মত বিনিময়ের পর রবিবর্মার 'জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী' ছবি সম্পর্কে রামানন্দ নিজ সিদ্ধান্তে আর অটল থাকতে পারলেন না। এ দেশীয় ভাবপ্রধান ছবির পক্ষ নিয়ে নিবেদিতা ভারতশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিষয়ে রামানন্দকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। নাছোড় নিবেদিতার প্রভাবে রামানন্দ ভারতশিল্পের নব্যযাত্রার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। নিবেদিতাও ক্রমশ রামানন্দের প্রবাসী ও পরবর্তীতে দ্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। রামানন্দের অনুরোধে নিবেদিতা চিত্রকলা বিষয়ে

দ্য মডার্ন রিভিউর জন্য ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখতেন আর সম্পাদক নিজে তা বাংলায় অনুবাদ করে প্রবাসীতে ছাপাতেন। এই বিষয়ে রামানন্দের স্মৃতিচারণ এইরকম: "তিনি আমার কাগজে লেখায় কয়েকটি বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়াছিল। আমি প্রথম প্রথম রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি ছাপিতাম। তিনি ক্রমাগত আমার সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া আমার এই বোধ জন্মান যে, রবিবর্মা ও তদ্বিধ অন্য ছবির রীতি ভারতীয় নহে, এবং পাশ্চাত্যরীতির চিত্র হিসেবেও সেগুলির উৎকর্ষ নাই।"[১৩]

তিনি শুধুমাত্র রামানন্দকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীদের ছবি ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেই থেমে থাকেননি, মডার্ন রিভিউতে ছাপা এঁদের ছবির সঙ্গে নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দিতেন। এই কাজে তিনি অবশ্য প্রয়াস পেয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভারতশিল্পের একনিষ্ঠ প্রচারকের সদিচ্ছার জন্য। নিবেদিতা ও রামানন্দের যৌথ উদ্যোগে ধীরে ধীরে সাধারণ বাঙালির ছবি দেখার চোখ ও মন তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে, ইংরেজি মডার্ন রিভিউ-এর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে অতিক্রম করে অ-ভারতীয়দের কাছে আধুনিক ভারতের শিল্পরূপ সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে-ঘরে। এই-যে ইন্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার— এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হতনা।... রামানন্দবাবু একনিষ্ঠভাবে এই কাজে খেটেছেন, টাকা ঢেলেছেন, চেষ্টা করেছেন, পাবলিকে ছবির demand create করেছেন। কত বাধা তিনি পেয়েছিলেন।... উনি ঘুরে ঘুরে কোথায় কী করতে হবে, কাকে দিয়ে করাতে হবে, গরিবেরও ঘরে-ঘরে, দেশবিদেশে সর্বত্র ছবির প্রচার করতে হবে— সবই নিজে করতেন। এ আমরা কখনই পারতুম না। তিনিই হাত বাড়িয়ে ভার তুলে নিলেন।... কে ছাপত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের হাতের ছেলে খেলার ছবি যদি-না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু?"[১৪]

কোম্পানির আমল থেকেই সাহেবদের মনে অজন্তা নিয়ে আগ্রহ জন্মেছিল। রবার্ট গিল ও গ্রিফিথ সাহেবের পর হ্যাভেল সাহেবের বন্ধু ডব্লিউ. হেরিংহ্যাম সাহেবের চিত্রশিল্পী স্ত্রী সি.যে. হেরিংহ্যাম অজন্তার ছবি নকল করার জন্য ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক চিত্রশিল্পী মিস দেভিস। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন এই সুযোগ দ্বিতীয় বার আসবে না। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন নন্দলাল আর অসিতকুমারকে তাঁদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অজন্তায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। পরের ছেলেদের বিভুঁইয়ে পাঠিয়ে চিন্তামুক্ত না হতে পেরে সেই মাসের শেষের দিকে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও অজন্তা পরিদর্শনে যান। নিছক ভ্রমণ নয়, একজন গবেষকের দৃষ্টিতে অজন্তা দর্শন করে ফিরে এসে লেখেন The Ancient Abbey of Ajanta। ১৯১০ সালে এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে দ্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক, গান্ধার শিল্পের প্রভাবের পাশাপাশি অজন্তার স্থাপত্যরীতি ও গুহাচিত্রগুলি সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেন। অজন্তাচর্চার ইতিহাসে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব আজও অস্বীকার করার উপায় নেই।

দ্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯০৭ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি— এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নিবেদিতার লেখা 'দি ফাংশন অব আর্ট ইন শেপিং ন্যাশন্যালিটি'। এই প্রবন্ধে তিনি শিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যের গভীর সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করেন। একটি জাতির অতীত কীর্তি বিস্মরণ আদপে আত্মঅবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মনে করতেন, এ দেশীয় চিত্রশিল্পীর কল্পনায় গ্রীক হেলেনও আসতে পারে, তাতে ক্ষতি কিছু নেই কিন্তু চিতোরের পদ্মিনীকেও ভুলে গেলে চলবে না, তাকেও নিজস্ব শিল্পভাবনার বিষয় করে তুলতে হবে। নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন, ভারতবর্ষ বহু যুগ ধরে শিল্প সৃষ্টির এক উর্বরভূমি— প্রতীক উপাসক বলে এখানে মানুষের মনে রূপের সংস্কার দৃঢ়মূল। হিন্দু ধর্ম একাংশে প্রতীক শিক্ষার সুমহান বিদ্যালয়। এদেশের প্রতিটি কৃষক, বাজারের সামান্য ক্রেতা বা ব্যাপারীও, ছবি কিংবা মূর্তি কিংবা পাত্র কিংবা যে-কোনো ধরনের অলঙ্কৃত প্রতীক ভালবাসে। ইতালির মতো এ দেশের মানুষেরও দৃষ্টির সংস্কৃতি নিখুঁত। আর আবহমান কাল ধরে মূর্তিপূজার অভ্যাসের ফলে এখানে চোখ রূপের প্রত্যাশী। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতে একমাত্র

শিল্পের ভাষা সর্বজনীন। বহুভাষাভাষী ভারতীয়রা একে অন্যের ভাষা না বুঝলেও ভারতীয় জীবনচর্যাগত নানা রূপের আকৃতিকে কিন্তু সহজেই বুঝে নেয়। এখানে প্রাদেশিকতা তাদের মধ্যে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এদেশে শিল্পের ভূমিকা সমন্বয় সাধকের। বিবিধের মধ্যে শিল্প নিজেকে প্রকাশ করে এক সাধারণ ভাষা রূপে। সে জন্য জাতীয় পুনর্গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে শিল্প, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন স্থিরসঙ্কল্প।

সুদূর অতীত থেকে ভারত বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পযুগ সৃষ্টি করে এসেছে। এলিফ্যান্টার ভাস্কর্য, অজন্তার চিত্রনির্মাণ, সাঁচি, অমরাবতী, গান্ধারের কাল পেরিয়ে মুসলিম আমলেও সেই সুউচ্চ শিল্পধারা একইভাবে অব্যাহত ছিল। কালের নিয়মে শিল্পের বিষয় পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ভারতীয় ধারার স্বাক্ষর-চিহ্ন কিন্তু একইরকম উজ্জ্বল থেকে গেছে। এমনই এক ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ শিল্পে নবযুগ সৃষ্টি করতে পারে, যদি সে বহমান শিল্প সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত ছিল, "শিল্পের কাঙ্খিত রূপের সঙ্গে শিল্পীর স্নায়ু-সম্বন্ধ থাকতে হবে। কোনো সত্যকার কবি যেমন স্বেচ্ছায় তাঁর সকল কবিতা বিদেশী ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, তেমনি কোনো চিত্রশিল্পী জনগণের বোধ্য রূপ ছাড়া শিল্প রচনায় সফল হতে পারেন না। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং অনুরূপ সকল বিষয়ের মহান অভিব্যক্তিগুলি অনেকাংশে মানব হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন— মানব হৃদয়ের সহানুভূতি লাভের জন্য—আর মানুষ তো সে কান্না মানুষের অজানা ভাষায় কাঁদে না।"[১৫] শিল্পের সর্বজনীন আবেদন প্রসঙ্গে তাঁর মত ছিল: "যে সৌন্দর্য বিশুদ্ধ তা অবশ্যই সমগ্র মানবসমাজের বোধগম্য।"[১৬] একটি পরাধীন দেশের মানবসমাজের দুঃখ যন্ত্রণাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, নিয়ত শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে, সৌন্দর্যচেতনার নির্বাধ চেতনায় দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ গ্লানিময়তা থেকে একটি জাতির উত্তরণ তথা মুক্তির সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা।

সূত্রনির্দেশ:

১. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, (১৪২৪), (অনূদিত), 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্', *নিবেদিতা লোকমাতা,* চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিসার্শ, পৃ. ১০২।

২. মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন, (১৯৬৮), *ভারতশিল্পী নন্দলাল,* প্রথম খণ্ড, রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, পৃ. ১৪৫।

৩. *তদেব।*

৪. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, (১৪১৮), *জোড়াসাঁকোর ধারে,* রাণী চন্দ, বিশ্বভারতী, বৈশাখ, পৃ. ১৩৭।

৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, (১৪১৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৩৮।

৬. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, (১৪১৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৩৯।

৭. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ ও বসু, সুদীপ, (২০০৯), (সম্পাদিত), *প্রবাসী ইতিহাসের ধারা-২,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৩২৪।

৮. মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন, (১৯৬৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৭।

৯. মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন, (১৯৬৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৯।

১০. বসু, নন্দলাল, (১৪২৪), দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শ্রী বরেন নিয়োগীকে লেখা পত্র, শান্তিনিকেতন, ২৫.০৮.৫৪, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৭৩।

১১. মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন, (১৯৬৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫১।

১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ ও বসু, সুদীপ, (২০০৯), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩০১।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, (১৩০৫), *ভগিনী নিবেদিতা,* উদ্বোধন, পৃ. ২০।

১৪. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, (১৩৫০), ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ, *প্রবাসী,* পৃ. ২৬১।

১৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, (১৪২৪), (অনূদিত) 'দি ফাংশন অব আর্ট ইন শেপিং ন্যাশন্যালিটি', *নিবেদিতা লোকমাতা,* চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৪৮।

১৬. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, (১৪২৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৯।